بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৪ এপ্রিল, ২০২০ মোতাবেক ২৪ শাহাদাত, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ *

(সূরা বাকারা: ১৮৪-১৮৬)

এ আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো, হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য সেভাবে রোযা রাখা বিধিবদ্ধ করা হলো যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দুর্বলতা হতে রক্ষা পাও।

পরের আয়াতের অনুবাদ হলো, অতএব তোমরা রোযা রাখ, হাতে গোণা কয়েকটি দিন মাত্র। আর তোমাদের মাঝে যদি কেউ অসুস্থ অথবা সফরে থাকে তাহলে তাকে অন্যান্য দিনে (রোযার) গণনা পূর্ণ করতে হবে। আর যারা এর অর্থাৎ রোযা রাখার সামর্থ্য রাখে না, তাদের জন্য ফিদিয়াস্বরূপ (সামর্থ্য থাকার শর্তে) একজন মিসকিনকে খাওয়ানো আবশ্যক। আর যে ব্যক্তি পূর্ণ আনুগত্যের সাথে কোন সৎকাজ করবে তা তার জন্য উত্তম হবে। তোমাদের জ্ঞান থাকলে বুঝতে পারতে যে, রোযা রাখাই তোমাদের জন্য শ্রেয়।

রমজান মাস সে মাস যার সম্পর্কে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। সেই কুরআন যা গোটা মানবজাতির জন্য হেদায়েতরূপে অবতীর্ণ করা হয়েছে আর যা নিজের ভেতর সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ বহন করে, এমন দলীল-প্রমাণ যা হেদায়েতের কারণ, আর এর পাশপাশি কুরআনে ঐশী নিদর্শনও রয়েছে। কাজেই, তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি এ মাসকে এ অবস্থায় পায় যে, সে অসুস্থও নয় আর সফরেও নয় তাহলে সে যেন এতে রোযা রাখে। আর যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা সফরে থাকে তার জন্য অন্যান্য দিনে (রোযার এ) সংখ্যা পূর্ণ করা আবশ্যক হবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান, তিনি তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না। আর তিনি এ নির্দেশ এ জন্য দিয়েছেন যাতে তোমরা কষ্টে নিপতিত না হও এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর আর আল্লাহ্ তোমাদের যে হেদায়েত দিয়েছেন সেজন্য তোমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বা মহিমা ঘোষণা কর, যাতে তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আগামীকাল থেকে এখানে রমজান আরম্ভ হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য রমজানের রোযা বিধিবদ্ধ করেছেন। পবিত্র কুরআনের প্রথম যে আয়াতটি আমি পাঠ করেছি তাতে বলা হয়েছে, তোমাদের জন্য রোযা এ কারণে

বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। তাকওয়া কী? এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন,

তাকওয়া হলো এই যে, মানুষ খোদার সকল আমানত এবং ঈমানী অঙ্গীকার, অনুরূপভাবে সৃষ্টির সকল আমানত এবং অঙ্গীকার রক্ষায় যথাসাধ্য যত্নবান থাকবে। অর্থাৎ সেগুলোর সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর দিক সমূহের ওপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ আমানত এবং অঙ্গীকারের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক সমূহকে দৃষ্টিপটে রেখে সেগুলো পালন করবে এবং সেগুলোকে শিরোধার্য করবে। অতএব এটি কোন সহজ কাজ নয়। হুকূকুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য কী আর হুকূকুল ইবাদ বা সৃষ্টির প্রাপ্য কী– এর তালিকা প্রস্তুত করতে গেলে মানুষ বিচলিত হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের দায়িত্বই আমরা পুরোপুরি পালন করতে অক্ষম। আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার এত অনুগ্রহ রয়েছে যে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন– তাঁর প্রাপ্য। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের এই দায়িত্ব আমরা পালন করি না আর করা সম্ভবও নয়। এটি না করেই অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামতরাজি হতে লাভবান হচ্ছে যেন এটি আমাদের প্রাপ্য অধিকার। অথচ তিনি যে আমাদের অবস্থা ও অকৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও আমাদেরকে কল্যাণমণ্ডিত করছেন– এটি আল্লাহ্ তা'লার একান্ত অনুগ্রহ। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লার সাথে কৃত আমাদের অঙ্গীকারও আমরা পূর্ণ করি না। অধিকন্তু সৃষ্টির প্রাপ্য অধিকার রয়েছে, পিতামাতার প্রাপ্য অধিকার রয়েছে, প্রতিবেশীর প্রাপ্য অধিকার রয়েছে, পথিকের অধিকার রয়েছে, সমাজের সার্বজনীন প্রাপ্য অধিকার রয়েছে– যা আমরা প্রদান করি না, অথচ এগুলো প্রদানের নির্দেশ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা সেই দায়িত্ব পালন করি না। অতএব আমরা যদি সূক্ষ্মতার সাথে যাচাই করি তাহলে দেখা যাবে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্যও প্রদান করছি না এবং বান্দারও না। আমি একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়েছিলাম, যাতে কিছু মৌলিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম, অর্থাৎ বান্দার বা সৃষ্টি ও আল্লাহ্ তা'লার যেসব প্রাপ্য রয়েছে- তার সংখ্যাও ২৮/২৯-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। যাহোক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

প্রকৃত ঈমান আর তাকওয়ার দাবি হলো, আল্লাহ্ তা'লার সাথে কৃত অঙ্গীকারও রক্ষা কর এবং সূক্ষ্মতায় গিয়ে কর। অনুরূপভাবে তাঁর আমানতের দায়িত্বও পালন কর এবং সূক্ষ্মতায় গিয়ে সুচারুরূপে পালন কর। তেমনিভাবে সৃষ্টির প্রাপ্য অধিকারও সূক্ষ্মতার সাথে প্রদান কর আর তার আমানতের দায়িত্বও ঐকান্তিক সচেতনতার সাথে পালন কর। কেবল তখনই বলা যেতে পারে যে, (তোমার মাঝে) তাকওয়া রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, রমজান মাস এজন্য এসেছে, রোযা রাখার প্রতি তোমাদের দৃষ্টি এজন্য আকর্ষণ করা হয়েছে যেন বছরের (বাকি) এগারো মাসে এসব অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি এবং ঘাটতি রয়ে গেছে সেগুলোকে এই মাসে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে বৈধ জিনিসকেও পরিত্যাগ করে, আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করে, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতে পূর্বের চেয়ে অধিক মনোযোগ প্রদান করে, বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তোমরা সেসব ঘাটতি পূর্ণ কর। এটি যদি কর– তাহলে এর নাম হলো তাকওয়া। আর এটিই রমজান এবং রোযার উদ্দেশ্য। আর মানুষ যখন এই মানসিকতা নিয়ে এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য রোযা রাখবে এবং রমজান অতিবাহিত করবে আর সৎ উদ্দেশ্যে অতিবাহিত করবে, তখন এই পরিবর্তন সাময়িক হবে না বরং একটি স্থায়ী পরিবর্তন হবে। আর তখন আল্লাহ্‌র প্রাপ্য প্রদানের প্রতিও স্থায়ীভাবে

দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে, যথাযথভাবে ইবাদত করার প্রতিও স্থায়ী মনোযোগ থাকবে, জাগতিক ব্যস্ততা এবং বৃথা কার্যকলাপ প্রাধান্য বিস্তার করবে না, মানুষের প্রাপ্য প্রদানের প্রতিও সার্বিক মনোযোগ নিবদ্ধ থাকবে, ব্যক্তিস্বার্থের জন্য আমরা মানুষের অধিকার হরণকারী হব না। আমরা যদি এ মানসে এবং এই সংকল্পের সাথে রোযার মাসে প্রবেশ না করি তাহলে রমজান মাসে প্রবেশ করা মূল্যহীন। মহানবী (সা.) এক স্থানে বলেছেন, যে বান্দা আল্লাহ্ তা'লার পথে তাঁর কৃপা যাচনা করে রোযা রাখে আল্লাহ্ তা'লা তার চেহারা এবং আগুনের মাঝে ৭০ 'খরীফ' দূরত্ব সৃষ্টি করে দেন। অর্থাৎ দুই ঋতুর মাঝে যে দূরত্ব হয়ে থাকে সে দূরত্ব। উদারহরণস্বরূপ হেমন্ত থেকে হেমন্তের দূরত্ব বা এক শীত থেকে পরবর্তী শীতকালের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। অর্থাৎ এক খরীফ থেকে অপর খরীফ পর্যন্ত এক বছরের দূরত্ব হয়ে থাকে। মোটকথা সত্তর বছরের দূরত্বের সমান দূরত্ব সৃষ্টি করে দেন। অতএব এ হলো রোযার কল্যাণ এবং এ হলো সেই তাকওয়া যা রোযা সৃষ্টি করে। রোযা কেবল ত্রিশ দিনের জন্যই তাকওয়া সৃষ্টি করে না বরং প্রকৃত রোযা সত্তর বছর পর্যন্ত আপন প্রভাব রাখে। আমরা যদি এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তাহলে দেখব, একজন সাবালক মুসলমানের ওপর রোযা ফরজ হওয়ার পর এই রোযা থেকে সত্যিকার কল্যাণ লাভ করে ও রোযার মূল তত্ত্ব বুঝে যে ব্যক্তি রোযা রাখে, সে রোযার মাঝে যেসব কল্যাণ আল্লাহ্ তা'লা রেখেছেন তা থেকে সারা জীবন কল্যাণ লাভ করতে থাকবে এবং তাকওয়ার পথসমূহ সন্ধান করতে থাকবে যা রোযার মূল উদ্দেশ্য। এভাবে সে আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা পাবে এবং ক্রমাগতভাবে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে থাকবে। চিন্তা করুন, আমাদের সমাজে যদি এমন রোযাদার সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে কত সুন্দর ও আদর্শ সমাজ হবে যেখানে আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য অধিকারও প্রদান করা হবে এবং বান্দার অধিকারও প্রদান করা হবে। এটিই সেই সুন্দর আদর্শ সমাজ যা প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন প্রত্যেক মু'মিন দেখে, বরং প্রত্যেক মানুষ নিজের অধিকার লাভ নিশ্চিত করার জন্য এমন সমাজ প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু যেমনটি আমি বলেছি, নিজের জন্য সাধারণত এটি পছন্দ করলেও অন্যের ক্ষেত্রে উক্ত অধিকারের কথা হয়ত সে বেমালুম ভুলে যায়। কিন্তু ইসলাম বলে, অন্যদের জন্যও তোমাকে উক্ত সমাজ গড়ে তুলতে হবে। শুধু নিজের সুযোগ-সুবিধা দেখলে চলবে না, নিজের স্বার্থ, নিজের অধিকার দেখলে চলবে না, বরং অন্যের অধিকারও রক্ষা করতে হবে, তাদেরও খেয়াল রাখতে হবে।

আজকাল ভাইরাস জনিত যে মহামারি ছেয়ে আছে তা রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধের জের হিসেবে অধিকাংশ মানুষকে গৃহবন্দি করে রেখেছে। এখানে জামা'তে একটি ভালো দিক সামনে আসছে, কোন কোন জায়গায় অন্যান্য লোকদের মাঝেও এই চেতনার সৃষ্টি হচ্ছে; কিন্তু বিশ্বের সব দেশে জামা'তের মাঝে বিশেষভাবে এদিকে দৃষ্টি রয়েছে যে, যেসব স্থানে মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন খোদ্দামুল আহমদীয়ার অধীনে, স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে সেখানে খাবার, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ও ঔষধ পৌঁছানোর কাজ তারা করে যাচ্ছে। অতএব, এই অধিকার প্রদানের মাধ্যমে তারা এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে, যার মাধ্যমে আপনজনেরা যেমন উপকৃত হচ্ছেন তেমনি অন্যরাও উপকৃত হয়ে প্রভাবিত হচ্ছেন। অতএব আজকাল মানব সেবার এই যে চেতনা সৃষ্টি হয়েছে, এই চেতনা আমাদের মাঝে শুধু জরুরী অবস্থায়ই নয় বরং স্থায়ীভাবে থাকা উচিত। যাহোক, এছাড়া আধ্যাত্মিক কী কী উপকারিতা রয়েছে, এ বিষয়ে মানুষ লিখছে যে, এর ফলে আমাদের ঘরে নতুন এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা সবাই ঘরে আবদ্ধ হয়ে আছি। সব নামায বাজামা'ত আদায় করা হচ্ছে, নামাযের পর সংক্ষিপ্ত

দরসও হচ্ছে, সবাই একসাথে বসে খুতবা দেখি, এছাড়া এমটিএ-তে প্রচারিত অন্যান্য অনুষ্ঠানও দেখি। এই লকডাউন যদি আরো দীর্ঘ হয় আর পুরো রমজান মাসব্যাপী তা চলতে থাকে তাহলে বাজামা'ত নামায, দরস এবং পঠন-পাঠন প্রভৃতি আরো অধিক মনোযোগ সহকারে করার চেষ্টা করা উচিত। শিশুকিশোরদের ছোট ছোট মাসলা-মাসায়েলও শিখান ও বলুন। আমি পূর্বেও একটি খুতবায় বলেছিলাম, এভাবে নিজেদের জ্ঞানও বৃদ্ধি করুন এবং সন্তানদের জ্ঞানও বৃদ্ধি করুন আর দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে নিজের জন্য এবং বিশ্ববাসীর জন্যও আল্লাহ্ তা'লার কাছে বিশেষভাবে কৃপা যাচনা করুন। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই যে দিনগুলো উপহার দিচ্ছেন এ থেকে পুরোপুরি লাভবান হওয়া উচিত। এই মহামারি সার্বিকভাবে ঘরে যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তা আরো উন্নত করার প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। সেসব জগতপূজারী ঘরের মতো হয়ে যাবেন না যাদের সম্পর্কে জানা যায় যে, সেখানে সার্বিকভাবে ঝগড়া-বিবাদ এবং বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি পবিত্র পরিবেশে যে পুণ্যকর্ম করার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে তার ফলে আমাদের উন্নতি হওয়ার কথা। যে ধর্মীয় পরিবেশ ঘরে সৃষ্টি হচ্ছে অনেক সময় পুরুষ পুরোপুরি সেই পরিবেশের অংশ হয় না, আর অনেক সময় মহিলাদের কাছে অন্য কোন বিষয় বেশি প্রধান্য পায়। এমন লোকদের এ চেতনাই নেই যে, এমন অবস্থায় কতটা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত হওয়া এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা প্রয়োজন। এটিই সেই সময় যখন সন্তানদেরকেও খোদা তা'লার অধিকতর নিকটবর্তী করা সম্ভব। অতএব আমাদের প্রত্যেক আহমদী পরিবারের উচিত, এই দিনগুলোতে এ দিকে অধিক মনোযোগ দেয়া যেন আমরা উত্তরোত্তর খোদা তা'লার অধিক ভালোবাসা লাভে সক্ষম হই এবং আমাদের পরিণাম যেন শুভ হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাকওয়ার প্রকৃত মর্ম বুঝা এবং তদনুযায়ী আমল করার সৌভাগ্য দান করুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে তাকওয়ার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হলেন এ যুগের সুরক্ষিত দুর্গ, সেই মজবুত আশ্রয়স্থল এবং দুর্গ, যিনি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে পথনির্দেশ লাভ করে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট করে, গভীর মর্মবেদনা নিয়ে আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের প্রদর্শিত পথ দেখিয়ে সেই নিরাপদ দুর্গে প্রবেশ করার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অতএব আমরা যারা এ অঙ্গীকার নিয়ে তাঁর জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছি যে, তাঁর কথা মেনে সে অনুযায়ী চলব, আমাদের ওপর সেই অঙ্গীকার রক্ষার কর্তব্য বর্তায়। তাই তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ কথায় গভীর অভিনিবেশ করে তদনুযায়ী চলা উচিত। আমরা যদি আমাদের অঙ্গীকার রক্ষা করি তাহলে এভাবে আমরা আমাদের ইহ ও পরকালও সুসজ্জিত ও সুনিশ্চিত করতে সক্ষম হব।

এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব যা তিনি বিভিন্ন বৈঠকে জামা'তের সদস্যদের সম্মুখে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও তাকওয়ায় উন্নতির জন্য বর্ণনা করেছেন। তাকওয়া কী আর কীভাবে তাকওয়া অর্জন করা সম্ভব, এক বৈঠকে এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

প্রথমে এটি বুঝা আবশ্যক যে, তাকওয়া কী জিনিস এবং কীভাবে তা অর্জন করা সম্ভব? তাকওয়া হল, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নোংরামি থেকে আত্মরক্ষা করা। তাকওয়া অর্জন করার উপায় হলো, মানুষের এমন পূর্ণাঙ্গীন চেষ্টা করা যার সুবাদে সে পাপের ধারে-কাছেও ঘেঁষবে না। এছাড়া নিছক প্রচেষ্টাকে যথেষ্ট মনে না করা, বরং যেভাবে দোয়া করা উচিত সেভাবে

দোয়া করা যাতে হৃদয় বিগলিত হয়। বৈঠকে, সিজদায়, রুকুতে, ক্বিয়ামে এবং তাহাজ্জুদে; এক কথায় সর্বাবস্থায় সকল মুহূর্তে এই চিন্তায় ও দোয়ায় রত থাকা যেন আল্লাহ্ তা'লা গুনাহ্ এবং পাপের নোংরামি থেকে মুক্তি দান করেন। মানুষ যদি গুনাহ এবং পাপ থেকে সুরক্ষিত ও নিষ্পাপ হয়ে যায় আর খোদা তা'লার দৃষ্টিতে পবিত্রচেতা এবং সত্যবাদী গণ্য হয় তাহলে এর চেয়ে উত্তম কোন নেয়ামত নেই। কিন্তু এই নেয়ামত নিছক প্রচেষ্টার মাধ্যমেও লাভ হয় না আর কেবল দোয়ার মাধ্যমেও নয়। অর্থাৎ নিছক চেষ্টাও যথেষ্ট নয় আর কেবল দোয়াও যথেষ্ট নয়, বরং এই দোয়া ও প্রচেষ্টার পূর্ণ ঐকতানের মাধ্যমেই তা সম্ভব। যতক্ষণ পর্যন্ত উভয় বিষয়কে পরম মার্গে না পৌঁছাবে এই নেয়ামত লাভ করা সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি কেবল দোয়া করে কিন্তু চেষ্টা করে না, সে পাপ করে এবং খোদা তা'লাকে পরীক্ষা করে। একইভাবে যে ব্যক্তি কেবল চেষ্টা করে কিন্তু দোয়া করে না, সেও ধৃষ্টতা দেখায় এবং খোদা তা'লার প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করে নিজ পরিকল্পনা, প্রচেষ্টা এবং বাহুবলে পুণ্য অর্জন করতে চায়। অর্থাৎ বাহুবলে পুণ্যার্জন সম্ভব নয়। কিন্তু সত্যিকার মু'মিন আর প্রকৃত মুসলমানের রীতি এটি নয়। সে চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং দোয়া উভয়ের মাধ্যমে কার্যসিদ্ধি করে। পুরো চেষ্টা করে, অর্থাৎ বাহ্যিক উপায়-উপকরণকে কাজে লাগায়, এরপর বিষয়টি খোদা তা'লার হাতে ছেড়ে দিয়ে দোয়া করে আর পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরাতেই এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে– إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (সূরা ফাতেহা: ০৫)। যে ব্যক্তি নিজ শক্তিবৃত্তিকে কাজে লাগায় না, সে নিজের শক্তিবৃত্তিকে কেবল নষ্ট ও এর অসম্মানই করে না বরং সে পাপ করে।

পুনরায় এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তিনি (আ.) এভাবে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে যে শক্তিবৃত্তি দিয়েছেন সেগুলোকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে ফলাফল সে আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দেয় এবং খোদার সমীপে নিবেদন করে যে, তুমি আমাকে যতটা সামর্থ্য দিয়েছ ততটা আমি এর দ্বারা কাজ নিয়েছি। এটিই হলো إِيَّاكَ نَعْبُدُ-এর অর্থ। এরপর إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ বলে খোদার কাছে এ সাহায্য যাচনা করে যে, আর পরবর্তী ধাপগুলোর জন্যও আমি তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। কিন্তু সর্বদা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের হৃদয়ের অবস্থা এবং আমাদের প্রতিটি কাজ সম্পর্কে সবিশেষ অবগত। তাই নিজেদের সর্বোচ্চ চেষ্টা-সাধনার পর অর্থাৎ যথাসম্ভব চেষ্টাসংগ্রামের পরই তাঁর সাহায্য যাচনা করা যেতে পারে। অতএব এ ক্ষেত্রেও খুব ভালোভাবে আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত আর দেখা উচিত যে, আমরা তাকওয়ার ভিত্তিতে কার্যসিদ্ধি করছি কি-না? এরপর তিনি (আ.) বলেন,

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন কোন সময় মানুষ চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে কাজে লাগায়। কিন্তু চেষ্টাসাধনার ওপর পূর্ণরূপে নির্ভর করা চরম অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা বৈ-কী। চেষ্টার পাশাপাশি যদি দোয়া না করা হয় তাহলে তা অর্থহীন আর দোয়ার পাশাপাশি যদি চেষ্টা-সাধনা না থাকে তাহলেও কোন লাভ নেই। যে জানালা দিয়ে পাপের অনুপ্রবেশ ঘটে প্রথমে সেই জানালা বন্ধ করা আবশ্যক। যে ছিদ্র বা যে স্থান দিয়ে পাপ ভিতরে অনুপ্রবেশ করে, অর্থাৎ পাপ, যা অবাধ্যতা ও ধর্ম থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণ হয়, প্রথমে তা দূরীভূত করা আবশ্যক। তিনি (আ.) বলেন, প্রথমে সেই জানালা বন্ধ করা উচিত আর এরপর প্রবৃত্তির টানাপোড়েনের (হাত থেকে বাঁচার) জন্য দোয়া করা উচিত। এ জন্যই বলা হয়েছে, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (সূরা আনকাবূত: ৭০)। তিনি (আ.) বলেন, (দেখ!) এখানে চেষ্টা-সাধনা করার প্রতি কত গুরুত্বের সাথে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। চেষ্টা-প্রচেষ্টায়ও খোদাকে পরিত্যাগ

করা অনুচিত। অপরদিকে বলেন, ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (সূরা মু'মিনঃ ৬১)। অতএব মানুষ যদি আন্তরিকভাবে তাকওয়া-প্রত্যাশী হয় তাহলে সে যেন চেষ্টা ও দোয়া করে। উভয় কাজ যেভাবে করা উচিত সেভাবে যেন করে। এমনটি হলে খোদা তার প্রতি দয়াদ্র হবেন, কিন্তু যদি একটি করে অপরটিকে ছেড়ে দেয় তাহলে সে বঞ্চিত থেকে যাবে। এ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

অতএব মানুষ এই পন্থা অবলম্বন করে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সে পন্থা কোনটি? তা হলো চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং দোয়া। আল্লাহ্‌র তাকওয়া হলো সকল বিষয়ের মূল, যার মাঝে এটি নেই সে পাপিষ্ঠ। তাকওয়ার মাধ্যমেই কর্মের সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। তাকওয়াই কর্মের মাঝে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে আর এর মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ হয় এবং এর মাধ্যমেই সে আল্লাহ্ তা'লার ওলী হয়ে যায়। যেমন তিনি বলেন, إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلاَّالْمُتَّقُونَ (সূরা আনফালঃ ৩৫)। পুনরায় এ বিষয়েরই অর্থাৎ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلاَّالْمُتَّقُونَ-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তিনি (আ.) এভাবে দিয়েছেন যে,

'বিলায়াত' তাকওয়ার ওপর নির্ভর করে। খোদার ভয়ে ভীত-ত্রস্ত থেকে যদি এটি অর্জন কর তাহলে উৎকৃষ্টতম মার্গে পৌঁছবে। তাকওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ওলী হওয়া যায়। হৃদয়ে যদি আল্লাহ্ তা'লার ভয় থাকে, তাঁকে যদি ভয় করতে থাক তাহলে মানুষ পরম মার্গে পৌঁছতে পারে। পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

তাকওয়ার কোন ধাপ যদি বাদ না পড়ে তাহলে সে আল্লাহ্‌র ওলীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় আর সত্যিকার অর্থে তাকওয়ার পরম মার্গ একটি মৃত্যু বৈ-কী। কেননা সব দিক থেকে যদি সে নফসের বিরোধিতা করে তাহলে নফস বা প্রবৃত্তি মারা যাবে। আর এ কারণেই বলা হয়েছে, **'মূতূ কাবলা আন তামূতূ'** (অর্থাৎ, তোমরা মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যু বরণ কর)। তিনি বলেন, অবাধ্য প্রবৃত্তি সর্বদা বাহ্যিক বা জাগতিক আনন্দ ও সুখের পেছনে ছুটে, অথচ আত্মিক ও অভ্যন্তরীণ আনন্দ ও সুখ সম্পর্কে সে একেবারেই অজ্ঞ। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লার সত্তার সাথে সম্পৃক্ত আনন্দ এবং আধ্যাত্মিক সুখ-ই হলো সুপ্ত ও গুপ্ত আনন্দ– সে তা জানেই না। কেবল জাগতিক চাকচিক্য সম্পর্কেই মানুষ অবহিত। অবাধ্য প্রবৃত্তি এসবেরই বাসনা রাখে। তিনি (আ.) বলেন, একে সচেতন করার জন্য আবশ্যক হলো প্রথমে বাহ্যিক সুখ-সম্ভোগের ওপর এক মৃত্যু আনয়ন করা আর তখনই নফস সেই অপ্রকাশিত বা সুপ্ত আনন্দ-আস্বাদন সম্পর্কে অবহিত হবে। অর্থাৎ বাহ্যিক আনন্দ-অভিলাষের মৃত্যু ঘটলে পরেই প্রবৃত্তি সুপ্ত আনন্দ কাকে বলে বুঝতে সক্ষম হবে। তিনি বলেন, তখন ঐশী আনন্দ বা সুখের সূচনা হবে, যা জান্নাতী জীবনের প্রতীক বা প্রমাণ। অতঃপর তিনি (আ.) জামা'তের সদস্যদের এই প্রসঙ্গে নসীহত করে বলেন, এখানে কোন বড় ওলীআল্লাহ্ কিংবা উচ্চমার্গে উপনীত ব্যক্তিকে তিনি নসীহত করছেন না বরং জামা'তের সাধারণ সদস্যদের উদ্দেশ্যে এই নসীহত করেছেন। এটি মনে করা উচিত নয় যে, এ পর্যায়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ মর্যাদা প্রয়োজন, কিংবা এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা কোন বিশেষ মর্যাদা চান, সবাই সেই মার্গে পৌঁছাতে পারে না। তিনি (আ.) সাধারণভাবে জামা'তের সকল সদস্যের উদ্দেশ্যে নসীহত করে বলেন, আমাদের জামা'তের প্রত্যেকের উচিত নিজের প্রবৃত্তির উপর এক মৃত্যু আনয়ন এবং তাকওয়া অর্জনের জন্য প্রাথমিকভাবে অনুশীলন করা যেভাবে শিশুরা আদর্শলিপি শেখার জন্য করে থাকে। শুরুর দিকে আঁকাবাঁকা অক্ষর লেখে কিন্তু লাগাতার অনুশীলনের ফলে অবশেষে নিজেই স্পষ্ট ও সোজা অক্ষর লিখতে সক্ষম হয়। একইভাবে তাদেরও অনুশীলন করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা যখন তাদের পরিশ্রম দেখবেন তখন তিনি নিজেই তাদের প্রতি দয়াদ্র হবেন। পূর্বে যে, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا (সূরা আনকাবূতঃ ৭০) বলেছেন এটিকে আরো স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا আয়াতে জিহাদ (বা চেষ্টা-প্রচেষ্টা) বলতে এই অনুশীলকেই বুঝানো হয়েছে। মানুষ পরিশ্রম করার পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করলে আল্লাহ্ তার প্রতি দয়া করেন এবং তাকে তার চেষ্টার প্রতিফল দান করেন। তিনি (আ.) বলেন, এখানে মুজাহেদা তথা চেষ্টা-সংগ্রাম বলতে এই অনুশীলনকেই বুঝায়। এক শিশুর অনুশীলন করার ন্যায় একদিকে দোয়া এবং অপরদিকে পরিপূর্ণ চেষ্টা-প্রচেষ্টা যদি চালিয়ে যায় তাহলে পরিশেষে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ হয় আর প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও তাড়না প্রশমিত ও শীতল হয়ে যায়। আগুনে পানি ঢাললে অবস্থা যেমন হয়, অবাধ্য প্রবৃত্তির অবস্থাও তেমনই হয়ে যায়। অনেকেই আছে যারা অবাধ্য আত্মার দাসত্বে লিপ্ত। এরপর তিনি (আ.) জামা'তের অভ্যন্তরীণ সংশোধনের জন্য বলেন,

আমি দেখি, জামা'তের সদস্যদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ হয়ে যায় অর্থাৎ পরস্পর ঝগড়া, মনোমালিন্য হয়, যার ফলে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে থাকে। সামান্য ঝগড়ার কারণে একে অপরের মান-সম্মানের ওপর হামলা করে এবং নিজের ভাইয়ের সাথে লড়াই-ঝগড়া করে। এটি খুবই অসঙ্গত আচরণ, এরূপ মোটেও হওয়া উচিত নয়। বরং কেউ যদি ভুল স্বীকার করে নেয় ক্ষতি কী? তিনি (আ.) বলেন, কতক মানুষ তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়েও দ্বিতীয় ব্যক্তি যতক্ষণ লাঞ্ছিত হওয়া মেনে না নেয় ততক্ষণ তার পিছু ছাড়ে না। এ ধরনের আচার-আচরণ পরিহার করা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লার এক নাম হল, **'সাত্তার'** (অর্থাৎ, তিনি বান্দার দোষত্রুটি ঢেকে রাখেন), তাই প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, কেন এরা নিজ ভাইয়ের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না, মার্জনা করে না এবং দোষত্রুটি গোপন করে না। নিজ ভাইয়ের দুর্বলতা ঢেকে রাখা উচিত এবং তার সম্মান-সম্ভ্রমে আক্রমণ করা উচিত নয়। এরপর তিনি (আ.) বলেন, জামা'তের মধ্যে এখনো অনেকেই এমন আছে যারা নিজেদের বিরুদ্ধে সামান্য কোন কথা শুনলেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে। অথচ স্বভাবে কোমলতা ও সহিষ্ণুতা সৃষ্টির জন্য এসব উন্মাদনা পরিহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি (আ.) বলেন, দেখা যায় যে, একটি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তর্ক আরম্ভ হয়, কিন্তু হৃদয়ে পরস্পরকে পরাজিত করার ফন্দি আঁটতে থাকে যাতে অন্যকে হেয় সাব্যস্ত করা যায় আর যাতে নিজে জয়যুক্ত হতে পারে? এমন পরিস্থিতিতে প্রবৃত্তির উত্তেজনা পরিহার করা উচিত এবং অশান্তি দূর করার লক্ষ্যে (এমন) তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে সবকিছু জেনেও নিজ থেকেই পরাজয় মেনে নেয়া উচিত। কখনো প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলকভাবে নিজের ভাইকে হেয় সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা উচিত নয়। তিনি (আ.) বলেন, অন্যের ত্রুটি খুঁজে বের করে তা প্রচার করে বেড়ানো– এটি ভয়াবহ অহংকারের মূল এবং মারাত্মক রোগ। নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার চিন্তা অহংকারের একটি মূল। অহংকারের মূল সম্পর্কে প্রথমে বলেছেন যে, অন্যের ত্রুটি খুঁজে বের করে তা প্রচার করা; এটিকে আরও স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন– নিজ ভাইয়ের উপর বিজয়ী হওয়ার চিন্তাও অহংকারের একটি মূল এবং মারাত্মক এক রোগ, কেননা তা ভাইয়ের দোষ প্রকাশ ও প্রচারে

উৎসাহিত করে। এমন কর্মকাণ্ডের ফলে আত্মা অপবিত্র হয়ে যায়, এথেকে বিরত থাকা উচিত। মোটকথা, এই যাবতীয় বিষয় তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত। আর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সব বিষয়ে তাকওয়া অবলম্বনকারীকে ফিরিশতাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কেননা তার মধ্যে কোন অবাধ্যতা অবশিষ্ট থাকে না। তাকওয়া অর্জন কর, কেননা তাকওয়া অর্জনের পরই খোদা তা'লার পক্ষ থেকে কল্যাণরাজি আসে। মুত্তাকী ব্যক্তিকে পার্থিব বিপদাপদ থেকে রক্ষা করা হয়, খোদা তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন। যতক্ষণ পর্যন্ত এই পদ্ধতি অবলম্বন না করা হবে কোন লাভ নেই। এমন মানুষ আমার হাতে বয়আত করে আদৌ লাভবান হয় না। তিনি বলেন, মনে রেখো, বয়আতের মৌখিক অঙ্গীকার কোন মূল্য রাখে না; আল্লাহ্ তা'লা আত্মার পরিশুদ্ধি চান। তিনি বলেন, কোন উপকারই হবে না; আর উপকার হবেই বা কীভাবে, কেননা একটি আমানিশা যে ভেতরেই রয়ে গেছে! যদি সেই উত্তেজনা, অহংকার, দাম্ভিকতা, আত্মশ্লাঘা, কপটতা, চট করে রেগে যাওয়ার বৈশিষ্ট্য থেকেই যায়, যা অন্যদের মধ্যেও রয়েছে, তবে পার্থক্যই বা কী? এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে– তাই নিজেদের মাঝে পরির্তন সাধন কর এবং নৈতিক চরিত্রের উন্নত দৃষ্টান্ত হও। তিনি বলেন, পুরো গ্রামে যদি একজনও পুণ্যবান থাকে মানুষ তার মাধ্যমে সেভাবে প্রভাবিত হবে যেমনটি নিদর্শনের মাধ্যমে হয়। তিনি (আ.) বলেন, যদি ভালো মানুষ হয় এবং পুণ্য স্বভাবের হয়, পরোপকারী হয়, নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, বিনয়ী হয়– তাহলে মানুষ তার দ্বারা প্রভাবিত হবে, যেমনটি মু'জিযার মাধ্যমে হয়। এটিও তবলীগ করার একটি মাধ্যম। পুণ্যবান মানুষ, যে আল্লাহ্ তা'লার ভয়কে দৃষ্টিপটে রেখে পুণ্য করে, তার মাঝে এক ঐশী প্রভাব ও প্রতাপ থাকে যা অন্যদের মনের ওপর পড়ে যে, এই ব্যক্তি আল্লাহ্ওয়ালা লোক। তিনি (আ.) বলেন, যত শত্রুতাই থাকুক না কেন, ধীরে ধীরে সবাই নিজে থেকেই তার অনুগামী হয়ে যাবে; আর তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার পরিবর্তে শ্রদ্ধা করা আরম্ভ করবে। তিনি বলেন, এটি পূর্ণ সত্য, যে ব্যক্তি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আসে, খোদা তা'লা তাকে নিজ মাহাত্ম্য থেকে অংশ দিয়ে থাকেন, আর এটি সৌভাগ্যমণ্ডিত হওয়ার পথ। সুতরাং মনে রেখো, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে ভাইদেরকে দুঃখ দেয়া উচিত নয়। মহানবী (সা.) হলেন যাবতীয় চারিত্রিক গুণাবলীর পরম বিকাশ, আর এখন খোদা তা'লা তাঁর চরিত্রের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখনও যদি সেই পাশবিকতাই রয়ে যায় তাহলে তা চরম পরিতাপ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়। অতএব, অন্যদের দোষারোপ করো না, কেননা কখনো কখনো মানুষ অন্যকে দোষারোপ করে নিজেই তাতে ধরা পড়ে। যদি তার মাঝে সেই দোষ না থেকে থাকে, আর তা সত্ত্বেও তুমি অপবাদ দাও– তবে তুমি নিজেই তাতে আক্রান্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু যাকে তুমি দোষারোপ করছ এবং বলছ যে, তার মাঝে এই দোষ আছে; সেই দোষ যদি সত্যি-সত্যিই তার মাঝে থেকে থাকে, তবে তা খোদা তা'লা দেখবেন; সেক্ষেত্রেও তাকে দোষারোপ করার কোন প্রয়োজন তোমার নেই। যদি দোষ থেকেও থাকে তবে সে নিজে খোদার সাথে বোঝাপড়া করবে; আর যদি (দোষ) না থেকে থাকে, তা সত্ত্বেও তুমি বলতে থাক– তাহলে

তা উল্টো তোমার উপর আপতিত হতে পারে। তিনি (আ.) বলেন, অনেক মানুষের অভ্যাস হলো, তারা চট করে ভাইদের উপর নোংরা অপবাদ দিয়ে বসে; এমন আচরণ পরিহার কর। মানবজাতির উপকার সাধন কর এবং নিজ ভাইদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কর। প্রতিবেশীদের সাথে উত্তম ব্যবহার কর, নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর; আর সবার আগে শির্ক এড়িয়ে চল– কারণ এটি তাকওয়ার প্রথম সোপান।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, তাকওয়ার অর্থ হলো পাপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পথ এড়িয়ে চলা। কিন্তু স্মরণ রেখো, পুণ্য কেবল এতটুকুই নয় যে, এক ব্যক্তি বলবে, আমি পুণ্যবান কেননা আমি কারো সম্পদ গ্রাস করি নি, শিঁধ কাটি নি, চুরি করি না, কুদৃষ্টি দেই না এবং ব্যভিচারও করি না। তত্ত্বজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে এরূপ পুণ্য ঠাট্টাযোগ্য। কেননা সে যদি এসব পাপে লিপ্ত থাকে, চুরি-ডাকাতি করে তবে সে শাস্তি পাবে। সুতরাং এগুলো কোন পুণ্য নয় যা তত্ত্বজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে মূল্যায়নযোগ্য হতে পারে। বরং প্রকৃত ও সত্যিকার পুণ্য হচ্ছে মানবজাতির সেবা করা এবং আল্লাহ্‌র পথে পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করা এবং তাঁর পথে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা। এজন্য এখানে বলা হয়েছে, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ (সূরা নাহল: ১২৮) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে আছেন যারা পাপ পরিহার করে চলে এবং এর পাশাপাশি পুণ্যকাজও করে। ভালোভাবে স্মরণ রেখো, শুধুমাত্র পাপ এড়িয়ে চলা কোন কাজের কথা নয়, যতক্ষণ না এর সাথে পুণ্যকাজ করা হয়। তিনি আরো বলেন, নিশ্চিত জেনো যে, সকল সাধুতা ও পুণ্যের মূল হচ্ছে খোদা তা'লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান যত দুর্বল হয় পুণ্যকাজেও ততই দুর্বলতা ও উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ঈমান যদি দৃঢ় হয়, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় বিশ্বাস সুদৃঢ় হলে কর্মও ভালো হবে। যখন ঈমান শক্তিশালী হয় এবং আল্লাহ্ তা'লাকে পূর্ণ গুণাবলীর আধার হিসেবে বিশ্বাস করা হয় তখন মানুষের কর্মেও অনুরূপ বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হয়। খোদা তা'লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী কখনো পাপ করতে পারে না। কেননা ঈমান তার রিপুর শক্তিবৃত্তিকে এবং পাপের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কেটে দেয়। তিনি বলেন, দেখ! যদি কারো চোখ উপড়ে ফেলা হয় তাহলে চোখের মাধ্যমে সে কীভাবে কুদৃষ্টি দিতে পারে এবং চোখের পাপ কীভাবে করবে? অনুরূপভাবে যদি তার হাত কেটে দেয়া হয় তাহলে এ অঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট পাপ সে কীভাবে করতে পারে? একইভাবে যখন কোন ব্যক্তি নফসে মুতমাইন্নাহ্‌র (অর্থাৎ শান্তিপ্রাপ্ত আত্মার) স্তরে থাকে তখন নফসে মুতমাইন্নাহ্ তাকে অন্ধ করে দেয় এবং তার চোখে পাপ করার শক্তি থাকে না। সে দেখেও দেখে না। অর্থাৎ দেখে কিন্তু কুদৃষ্টি দিয়ে দেখে না, পাপের দৃষ্টিতে দেখে না; কেননা চোখের পাপের শক্তি কেড়ে নেয়া হয়। সে কান থাকা সত্ত্বেও বধির হয়ে থাকে, শুনে কিন্তু নোংরা বিষয় শুনে না। আর যেগুলো পাপের কথা সেগুলো শুনতে পারে না। একইভাবে তার রিপুর সকল তাড়না ও কামশক্তি এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা হয়। তার সকল শক্তির ওপর, যার দ্বারা পাপ সংঘটিত হতে পারে, এক মৃত্যু এসে যায়। সে সম্পূর্ণভাবে এক লাশ সদৃশ হয়ে যায় এবং খোদাতা'লার ইচ্ছার অধীনস্ত হয়ে যায়। তাঁর ইচ্ছা পরিপন্থী একটি পদক্ষেপও সে নিতে পারে না। এটি তখন হয় যখন খোদাতা'লার ওপর প্রকৃত ঈমান থাকে এবং এর ফলে তাকে পরিপূর্ণ প্রশান্তি প্রদান করা হয়। তিনি বলেন, এটিই সেই মর্যাদা যা অর্জন করা মানুষের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। তিনি জামা'তকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমাদের জামা'তের

এর প্রয়োজন রয়েছে এবং পরিপূর্ণ প্রশান্তি অর্জনের জন্য পরিপূর্ণ ঈমানের প্রয়োজন। তিনি বলেন, অতএব আমাদের জামা'তের প্রথম দায়িত্ব হলো, আল্লাহ্ তা'লার সত্তা সম্পর্কে প্রকৃত ঈমান অর্জন করা।

এরপর তিনি বলেন, খোদা কাউকে পবিত্র না করলে কেউ পবিত্র হতে পারে না। যখন খোদা তা'লার দরবারে বিনয় এবং কাকুতিমিনতির সাথে মানুষের আত্মা সেজদাবনত হবে তখন খোদা তা'লা তার দোয়া গ্রহণ করবেন এবং সে পূর্ণতা লাভ করবে। তখন সে মহানবী (সা.)-এর ধর্মকে বুঝার যোগ্যতা অর্জন করবে। অন্যথায়, ধর্ম ধর্ম বলে সে যে চিৎকার করে এবং যে ইবাদত ইত্যাদি করে থাকে, তা নিছক প্রথাগত বিষয় ও ধ্যানধারণা বৈ কিছু নয় যা পিতাপিতামহের অনুকরণে সে পালন করে থাকে। অর্থাৎ পিতাপিতামহ করেছিলেন তাই আমিও করছি; কোন সার এবং আধ্যাত্মিকতা এর মাঝে থাকে না।

অতএব এটি হলো তাকওয়ার সেই মান আর এটি হলো ধর্মকে বুঝার, জানার এবং আমল করার সেই মানদণ্ড যা অর্জন করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আর যা অর্জনের চেষ্টা আমাদের করা উচিত। নিজেদের কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনয়াবনত হয়ে তাঁর সাহায্য যাচনা করা উচিত, যেন খোদা তা'লা আমাদেরকে এসব মানে উপনীত হওয়া এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রত্যাশা অনুযায়ী জীবন পরিচালনার তৌফিক দান করেন। আর এই তাকওয়াই পরবর্তী আয়াতে রোযার বিষয়গুলোর ব্যাখ্যায় যা বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ এতে প্রদত্ত ছাড় বা সুযোগের সদ্ব্যবহারের তৌফিক দান করে। এটিকে আল্লাহ্ তা'লা তাকওয়ার শর্তে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। যদি রোযা রাখার সামর্থ্য না থাকে বা এমন কোন রোগ থাকে, যার ফলে রোযা সহ্য করা কঠিন হয় অথবা এমন কোন রোগ থাকে যে ব্যাপারে ডাক্তার বলে দেয় যে, রোযা রাখা যাবে না, সেক্ষেত্রে এমন ব্যক্তির ফিদিয়া দিয়ে দেয়া উচিত, কিন্তু অজুহাত অন্বেষণ করে ফিদিয়ার বৈধতা খুঁজতে যেয়ো না। বরং তিনি বলেন, পুণ্য কাজের জন্য আনুগত্য প্রদর্শন আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা এই কাজ কীভাবে করার আদেশ দিয়েছেন– তা দেখা উচিত। অতএব গভীরে গিয়ে তাকওয়ার পথে চলে কেউ যদি আত্মবিশ্লেষণ করে তাহলে বুঝা যাবে যে, রোযা রাখাই উত্তম নাকি ফিদিয়া দেয়া উত্তম। পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা আরো বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কেউ অসুস্থ থাকে বা সফরে থাকে তাহলে সে যেন রোযা না রাখে, কেননা আল্লাহ্ তা'লা মানুষের কাঠিন্য চান না আর যখন রোগ সেরে যায় তখন যেন ছেড়ে দেয়া রোযাগুলো পূর্ণ করে নেয়। ফিদিয়া দিয়ে দিলেও সফরের কারণে যে রোযা ছুটে গিয়েছে তা পূর্ণ কর। ঘুরে ফিরে আবার একই কথা দাঁড়ায় যে, তাকওয়ার ভিত্তিতে খোদাভীতি এবং আল্লাহ্ আমাদের সকল অবস্থা সম্পর্কে অবহিত-অবগত– এ সত্য দৃষ্টিপটে রেখে নিজেদের সব সিদ্ধান্ত নাও; তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জন্য উত্তম অবস্থা সৃষ্টি করে দিবেন, উত্তম ফলাফল সৃষ্টি করে দিবেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

যার অন্তর রমজানের আগমনে একথা ভেবে আনন্দিত হয় যে, রোযা রাখার মানসে আমি রমজানের অপেক্ষায় ছিলাম কিন্তু রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণে সে রোযা রাখতে পারে নি; ঊর্ধ্বলোকে সে রোযা থেকে বঞ্চিত থাকবে না। তিনি বলেন, এ জগতে অজুহাতসন্ধানী অনেক লোক আছে অর্থাৎ বাহানা সন্ধান করে এবং মনে করে যে, আমরা জগদ্বাসীকে যেভাবে প্রতারিত করি তেমনিভাবে খোদা তা'লাকেও প্রতারিত করব। অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষকে ধোকা

দিয়েছি তাই আল্লাহকেও ধোকা দেয়া সম্ভব। বাহানা সন্ধানীরা নিজেরাই নিজেদের কাছে অজুহাত সন্ধান করে এবং নিজেরাই অজুহাত দাঁড় করায় আর এর সাথে কৃত্তিম ধ্যানধারণা যোগ করে সেগুলোকে একান্ত সঠিক ধরে নেয় আর বলে, এটি হয়েছে, সেটি হয়েছে, আর মনে করে যে, এভাবে রোযা পরিত্যাগ করার যথার্থ কারণ সৃষ্টি হয়ে গেছে। তিনি বলেন, কিন্তু খোদা তা'লার দৃষ্টিতে তা সঠিক নয়। কৃত্রিমতার দ্বার অনেক প্রশস্ত, যদি বাহানা করতে হয়, অজুহাত সন্ধান করতে হয় তাহলে একের পর এক অজুহাত সৃষ্টি হতে থাকে। তিনি বলেন, যদি মানুষ এসকল কৃত্রিম অজুহাতকে ভিত্তি বানাতে চায় তাহলে সারা জীবন বসে বসে নামায পড়তে পারে এবং রমজানের রোযা পুরোটাই ছেড়ে দিতে পারে, কিন্তু খোদা তা'লা তার নিয়্যত ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত। তিনি অদৃশ্যের জ্ঞাতা। তিনি আমাদের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে কী আছে তা-ও জানেন, তিনি আমাদের নিয়্যত কী তা-ও জানেন, আমাদের উদ্দেশ্যাবলী কী তা-ও জানেন। তিনি বলেন, যে সততা ও নিষ্ঠা রাখে তার সাথে আল্লাহ্ তা'লাও অনুরূপ ব্যবহারই করে থাকেন। কিন্তু যে বাহানা করে তার সাথে তার অচরণ অনুসারেই ব্যবহার করে থাকেন; কেননা আল্লাহ্ তা'লা সবই জানেন। যে সততা ও নিষ্ঠা রাখে আল্লাহ্ তা'লা তার সম্পর্কে অবগত; খোদা তা'লা জানেন তার মাঝে নিষ্ঠা রয়েছে। যে অজুহাত দেখায়, তার মাঝে নিষ্ঠা নেই। খোদা তা'লা নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে প্রতিদানও বেশি দিয়ে থাকেন, কেননা ব্যথিত হৃদয় বা আন্তরিকতা একটি মূল্যবান বিষয়। অজুহাত সন্ধানী মানুষ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে, কিন্তু খোদা তালার দৃষ্টিতে এমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে নির্ভর করা কোন মূল্য রাখে না। অতএব এই নীতি আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, যারা মুসাফির এবং অসুস্থ তাদের জন্য পরবর্তীতে রোযা পূর্ণ করতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এটিও বলেছেন যে, এই অবস্থাতেও ফিদিয়া অবশ্যই দাও। এতে রোযা রাখার সামর্থ্য লাভ হবে।

আজকাল ভাইরাসজনিত রোগের কারণে মানুষ প্রশ্ন করে থাকে যে, গলা শুকিয়ে যাবে এবং রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে; তাই রোযা রাখবো নাকি রাখবো না? এই বিষয়ে আমি কোন সাধারণ ফতোয়া বা সিদ্বান্ত প্রদান করছি না। আমি সাধারণত এটি-ই লিখে থাকি যে, তোমরা নিজেদের অবস্থা বিবেচনা করে নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। আর পবিত্র হৃদয়ে তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজের বিবেকের কাছে ফতোয়া চাও। পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে, অসুস্থ হলে রোযা রেখো না। কিন্তু অসুস্থ হয়ে যাবো এই ধারণার বশবর্তী হয়ে রোযা পরিত্যাগ করা ভ্রান্ত রীতি। তাহলে তো একটি অজুহাত হতে আরেকটি অজুহাত, এক বাহানা থেকে আরেক বাহানা সৃষ্টি হতেই থাকবে– যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন। যদি কেউ বলে, ডাক্তার বলছে, এর ফলে সমস্যা হতে পারে, সেক্ষেত্রে আমার উত্তর হলো আমি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মতামত নিয়েছি। ডাক্তারদের পারস্পরিক মতামতের মধ্যেও মতপার্থক্য রয়েছে। কতিপয় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, এটি কোন নিশ্চিত বিষয় নয় যে, রোযা রাখলে অবশ্যই এ রোগ দেখা দিবে। হ্যাঁ, যদি লক্ষণাবলী প্রকাশ পায়, কাশি অথবা হালকা জ্বর অথবা অন্য কোন লক্ষণ দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে রোযা ছেড়ে দিন আর যদি রোযা রেখে থাকেন তবে ভেঙে ফেলুন। ডাক্তারদের মধ্যেও যারা এই মতকে সমর্থন করেন যে, রোযা না রাখাই ভালো বা এমন শর্ত জুড়ে দেন যার ফলাফল এমনই দাঁড়ায় যে, রোযা রাখা উচিত নয়– তারাও স্পষ্ট কোন মতামত প্রকাশ করে না। তারা ভয়ও দেখায়, আবার সাথে এটিও বলে যে, খাবারের প্রতি

দৃষ্টি রেখে যেন রাখা হয়। এখন যারা দরিদ্র তারা কতটুকু-ই বা খাবারের প্রতি দৃষ্টি রাখতে সক্ষম হবে।

মোটকথা, বিভিন্ন মতামত পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, রোযা রাখতে কোন অসুবিধা নেই। তবে হ্যাঁ, সামন্যতম সন্দেহ হলেও তাৎক্ষণিকভাবে রোযা ছেড়ে দিন। কেউ কেউ মনে করে, যে ঘরে এ রোগে আক্রান্ত কোন রোগী থাকে সে ঘরে অন্যরা সুস্থ্য হলেও তারা যেন রোযা না রাখে কিন্তু অন্যান্য চিকিৎসকদের মতে এর কোন বৈধতা নেই। যাহোক, রোযা শেষে এবং রোযা রাখার সময় পানি বেশি পান করা উচিত। যারা নিজেদের নিয়ে বেশি চিন্তিত এবং সামর্থ্যও রাখেন তারা এমন খাবার গ্রহণ করুন যা দেহে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত পানি ধরে রাখতে পারে। মোটকথা, এ বিষয়ে চিকিৎসকদের মধ্যে দ্বিমত আছে এদের মাঝে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী ও এখানকার চিকিৎসকরাও রয়েছেন। তাই অকারণে রোযা পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য করা উচিত যে, পাছে আমরা আবার তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই যাদের সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, এরা বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে। তবে হ্যাঁ, সাবধানতা অবশ্যই অবলম্বন করা উচিত। কারো কারো পানির চাহিদা এমনিতেই কম থাকে, তারা সাধারণত পানি পান করে না। রোযাও রাখে আর স্বাভাবিক অবস্থাতেও খুব বেশি পানি পান করে না। আমাদের একজন বুযুর্গ ছিলেন চৌধুরি নযীর সাহেব; তিনি গ্রীষ্মকালে সারাদিন ঘুরে বেড়াতেন অথচ আমরা (বাইরে থেকে) এসেই পানির দিকে ছুটে যেতাম; কিন্তু আমি তাকে কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছি, আপনি এত অল্প পানি পান করেন, কোন কোন সময় তো তা-ও করেন না! তিনি বলেন, আমার পানির চাহিদাই কম। যাহোক, বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ আছে। এমতাবস্থায় প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থা ও প্রকৃতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। নিজের বিবেকের কাছে জিজ্ঞেস করুন।

রোযা রাখার জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে সামর্থ্য বা সক্ষমতা যাচনা করে দোয়া করুন। এ দিনগুলোতে আল্লাহ্ তা'লার কাছে বেশি বেশি দোয়া করুন, আল্লাহ্ যেন মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দান করেন। মানুষ যেন আল্লাহ্ তা'লাকে চিনে। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবী থেকে এই মহামারিকে অচিরেই দূরীভূত করুন; পৃথিবীবাসীর প্রতি আল্লাহ্ তা'লা করুণা করুন এবং আমরা আহমদীরাও যেন তাকওয়ার পথে প্রতিষ্ঠিত থেকে আল্লাহ্ এবং বান্দার অধিকার রক্ষা করতে পারি এবং রমজান থেকে পরিপূর্ণ রূপে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারি। এটিও স্মরণ রাখুন, বিশ্বে বর্তমানে যে অবস্থা বিরাজ করছে অর্থাৎ এ মহামারির ফলে গোটা বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থার যে চরম অবনতি ঘটেছে, আর বর্তমানে যে অর্থনৈতিক অবস্থা বিরাজমান রয়েছে, এমন অবস্থা যখন দেখা দেয় তখন যুদ্ধের আশঙ্কাও বেড়ে যায়। অনেক বিশ্লেষক এ ধরনের কথাও বলছেন। বস্তুবাদী বিভিন্ন সরকার নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জাগতিক উপায়ে এর সমাধান বের করার চেষ্টা করে থাকে। তারা স্বদেশী নাগরিকদের মনযোগ ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য এমন কথা বলে যা পরবর্তীতে তাদেরকে আরো বেশি সমস্যার মুখে ঠেলে দেয়ার কারণ হয়, যার ফলে তারা ধ্বংসের দিকে আরো বেশি অগ্রসর হয়। যেমনটি আমি বলেছি, ভাষ্যকাররা এ ধরনের মতামত ব্যক্ত করা আরম্ভ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমতাধর দেশগুলোকে সুমতি দিন তারা যেন বিবেক খাটায় আর এমন কোন পদক্ষেপ না নেয় যার ফলে পৃথিবীতে আরও বেশি নৈরাজ্য দেখা দিবে এবং ধ্বংসযজ্ঞ বাড়বে। এখন পত্রপত্রিকায় প্রকাশ্যে এ বিষয়ে লেখালেখি হচ্ছে আর বিশেষজ্ঞরাও খোলাখুলি কথা বলছেন। আমেরিকা

ইরানকে হুমকি দিয়েছে, আবার চীনকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে যে, তারা এই মহামারির বিষয়ে সঠিক তথ্য দেয়নি, এজন্য তাদের বিরুদ্ধে মামলা হওয়া উচিত বা তার সাথে এমন ব্যবহার হওয়া উচিত। আমরা ইরানের সাথে হেন করবো তেন করবো। যাহোক, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশেরও কাণ্ডজ্ঞান খাটানো উচিত। এমন পরিস্থিতিতে পৃথিবীতে ধ্বংসযজ্ঞ ছড়ায় এমন কোন ভুল পদক্ষেপ না নিয়ে সঠিক চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা করে এবং আল্লাহ্ তা'লার দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে এই মহামারি থেকে মুক্তির দোয়া ও চেষ্টা করা উচিত এবং এই মহামারির প্রতিষেধক আবিষ্কারে যেসব বিজ্ঞানীরা কাজ করছেন তাদের সহায়তা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দোয়া করার ও নিজেদের অবস্থায় উন্নতি সাধনের তৌফিক দিন এবং বিশ্ববাসী ও ক্ষমতাধর দেশগুলোকে বুদ্ধিমত্তার সাথে নিজেদের নীতি ও ভবিষ্যত কর্মবিধি নির্ধারণের তৌফিক দিন। (আমীন)